নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় -
বাহিরেতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে - প্রাণ হয়ে আছে ভোর।।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ -
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর -
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।

বিশ্লেষণ:

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি জগৎ নানা বৈশিষ্ট্যে বিশাল। তবে তা কেবল সংখ্যাতত্ত্বে নয়, গুণতত্ত্বেও চেতনাসিদ্ধ বৈচিত্র্যে অনন্য। এ অনন্য সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে কেবল একটি কবিতার মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ কতটুকু সম্পূর্ণ হবে জানি না, তবে কবিতাটির গুরুত্ব অর্থতত্ত্বে বা পাঠকমাপে কিংবা রবীন্দ্র-মানস গঠনে যথেষ্ট উদ্দীপকের ভূমিকা রেখেছিল তা বলা চলে (এ যেন কবিত্ব লাভের এক সিনাছাঁক উপলব্ধি)। কবির স্বগতোক্তি- 'আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিলাম। একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম; কিন্তু সেদিন কে জানিত এ কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।' (জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ) তা'হলে কথাটি সত্যের কাছে এসে দাঁড়াল যে, রবীন্দ্র কাব্যের মূল ভূমিকার কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবিতাটির স্রষ্টা এবং পাঠক বলেই তার তৃপ্তিকর ব্যাখ্যার জনক তিনিই। শুধু ভালোলাগা থেকে কবিতা নয়- কবিতা থেকেও ভালোলাগা হয়। তারই সমর্থনে যুক্তি প্রদান কবিতাটির গণমাত্রা তৈরি করেছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির চৌদ্দ নম্বরের শিশুপুত্র তের বছর দশ মাস বয়সে মা হারা হয়ে চাকর-বাকরদের মহলে এবং কনিষ্ঠ বৌদির যত্ন-সাহচর্যে বেড়ে ওঠার মধ্যেই তার ঘরোয়া অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। এবং এরই মাঝে তার কাব্যচর্চারও শুরু। শৈশবকালের তের বছর থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যের লেখা কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে- বনফুল, কবি কাহিনী, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, শৈশবসংগীত ইত্যাদি তার প্রথম পর্যায়ের কাঁচা লেখা। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতার বই সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, কড়ি ও কোমল আঠারো থেকে বাইশ বছরের মধ্যে লেখা। ১৮৮৩ সালে প্রভাতসংগীত কাব্যটির প্রকাশ। এ কাব্যগ্রন্থের কবিতায় হচ্ছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। শৈশব থেকে কবি হওয়ার বাসনা ধরে সংশোধিত হতে হতে তিনি প্রভাতসংগীতের কাছে পৌঁছে যান। এ কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি তার কাব্যচর্চার সার্থক সৃষ্টি বলেই তিনি মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। কবিতাটিতে বাইরের জিনিসকে অন্তরে এবং তার রসায়নই যে এই কবিতার মূল নির্যাস তা তার চিত্তের উচ্ছ্বাস থেকেই বোঝা যায়। এ কবিতায় কবি যেন গ্রহীতা আর প্রকৃতি হচ্ছে দাতা। প্রকৃতির অকৃপণ দান কবি আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেছেন। ১৮৮৩ সাল কবির জীবনে দুটি কারণে স্মরণীয় একটি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার গ্রন্থভুক্তি এবং প্রকাশ অপরটি তার বিয়ে। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাইশ বছর আট মাস বয়সে কবি রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়। যশোরের মেয়ে ভবতারিণী পরে মৃণালিনী এগার বছর বয়সে তার স্ত্রী হয়ে আসেন। শৈশব এবং কৈশোরের জীবন যাপন কবি খুব একটা উপভোগ করেননি। তিনি জীবনস্মৃতিতে নিয়ম-কানুন এবং পরিবারের অনুশাসনের কথা ধরেই নানা কাহিনীর বর্ণনা দেন। 'বাড়ির বাইরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমনকি বাড়ির ভেতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম।' (জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ)। এমন অবস্থার ভেতর রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসুমন বারবার বাইরে অসীমের পানে বেরুবার স্বপ্ন দেখেছে।

২. 'রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন। সব মানুষই দেখে থাকে, দেখতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হয়েছিল আরও বেশি করে। রবীন্দ্রনাথদের দেখতে হয়। শুরু হয়েছিল সেই কোন শৈশবে, জানালার পাশে বসে সলিল ও মহীরুহের আমন্ত্রণে। আন্না তড়খড় বিলেতি শ্বেতাঙ্গিনী, কী

কাদম্বরীদের দূর প্রস্থানেও স্বপ্ন ভাঙে না। ডাইমেনশন পায়; স্বপ্নের আলোছায়ায় চিত্রল বর্ণসম্পাত ঘটে।' (হায়াৎ মামুদ : স্বপ্নের মাত্রাভেদ প্রবন্ধ)। সেই স্বপ্ন আর ইচ্ছের পাখায় যখন উড়বার বাসনা, ঠিক তখনই এক সকালে ঘটে গেল কবির দৃষ্টিতে মনোরম প্রাকৃতিক ঘটনা। 'একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলোর পল্লাবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতে ছিল। চাহিয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার 'চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটা অপরূপ মহিমায়, বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদান ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভেতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।' (জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ)। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর/কেমনে পশিল প্রাণের পর/কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান!/না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ/জাগিয়া উঠেছে প্রাণ/ওরে উথলি উঠেছে বারি/ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।' (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ)। কবি মনের এ উৎফুল্ল আবেগকে ডিভাইন স্পিরিট বা নেচারাল গিফটও বলা যায়। যাকে পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ জীবন দেবতা বলেছেন। 'ছয়শত বৎসর আগে দান্তেও হঠাৎ একটা ঘটনার পর বলিয়াছিলেন, আজ হইতে নবজীবন আরম্ভ হইল। দেখ, এই দেবতা যিনি আমার উপর আধিপত্য করিতে আসিলেন তিনি আমার চেয়ে শক্তিমান।' (আíঘাতী রবীন্দ্রনাথ : নীরদচন্দ্র চৌধুরী)। তাই রবীন্দ্রনাথের এমনই শক্তির শুরুটা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি ধরেই। এই কবিতা তার সিনাছাঁক হওয়া বিশুদ্ধ মনেরই ছন্দময় সৃষ্টি।

কবিতাটির ভেতর কয়েকটি অনুভূতি স্পষ্ট হয়েছে যেমন অভিভূত হওয়া, বিমুগ্ধতা, জাগরণ, গতিবাদ, প্রথাবিরোধিতা, প্রকৃতি-স্তুতি, বিদ্রোহ এবং জীবন-প্রকৃতির অন্বয়। দৃষ্টিতে যে সুন্দর, তার ছোঁয়ায় মন-প্রাণে আসে শিহরণ এবং সৃজন। সেই সৃজন কবি মনের। এ কবি মনের খবর তো কেউ রাখে না তা থাকে জীবন যাপনের আবরণে ঢাকা। এটা যেন কবির দীর্ঘদিনের অপেক্ষার ফল। তিনি হয়তো কখন, কোনো অবস্থাতে যে, স্বপ্ন পারের ডাক শুনেছিলেন তারই এক উত্তর একেবারে শরীরী উপস্থিতিতে শান্তি আর শক্তির পুনর্মিলন। 'থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন ছায়ে সুপ্ত হয়ে, গুপ্ত হয়ে, গুপ্ত গৃহ বাসে।' (রবীন্দ্রনাথ)। সত্যি শৈশব-কৈশোরের গৃহকোণের এমনই অনুশাসনের অভিজ্ঞতা কবি মনে সৃষ্টি করেছিল সুদূরের ভাবনা। সেই ভাবনার জাল কবির অন্তরশক্তিকে উজ্জীবন দিয়েছিল। কবি এতদিন যে ভাবনা ধরে ছিলেন তা গার্হস্থ্য-জীবনের চার দেয়ালের মধ্যে আলোবিহীন অন্ধকার গুহার, ঘুমন্ত-স্বপ্নময় এবং শীতল। হঠাৎ দেখা সকালের রবির কিরণ কবি মনে সৃষ্টি করেছে নতুন ভরপুর এক আনন্দ। এমনই বিগলিত কবি হৃদয়ে জেগে ওঠেন কবি রবি। এ জেগে ওঠা মানে প্রকৃতিপ্রবণ হয়ে ওঠা অর্থাৎ কিনা তাই-ই হচ্ছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। ব্যক্তি সৌন্দর্য এবং অসীমতায় কবির আত্মনিবেদনই যেন নির্ঝরের প্রতীকী প্রকাশ। এখানে কবি কবিতার স্বার্থে নিরপেক্ষ থেকে জেগে উঠেছেন সৃজনের শক্তিতে। যে শক্তির রূপরেখা সব অসুন্দর আর সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সাহসী উচ্চারণে দেয়াল ভাঙার। ঝর্ণার গতি ছন্দময় এবং সবকিছুকে নিয়ে ছুটে চলা। তার ঢেউ এক একটি শিলাখণ্ডকে যেভাবে গড়িয়ে নেয় সেভাবে কবিও চাইছেন তার মনের ঝর্ণা ধারাটিকে গতিশীল করতে। সব

প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবেলা করে ওপরে ওঠার বাসনা তার। এ ওপর বলতে তিনি বারবার ভূধর (পর্বত) শিখরের উপমা টেনেছেন। একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারের গড়ন যেন এমনি পাহাড়-পর্বত সমান তারই মাঝে জন্ম নেয়া কবি ঝরনার গান। একাকী আপন মনে গতিশীল। যা তার সে গতি উদ্দেশ্যহীন একরৈখিক এক অনুগত প্রাণ। হঠাৎ দেখা সেই রবি কিরণ কবির মনে প্লাবন তৈরি করেছে। এ সত্যে কবি এখন আত্মবিশ্বাসী সৃষ্টিশীল সাহসী উৎফুল্ল চেতনায় অস্থির। 'কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ/দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান/ওরে চারিদিকে মোর/একী কারাগার ঘোর/ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ কারা আঘাতে আঘাত কর/ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি/ এসেছে রবির কর।' (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ)।

কবিতাটিতে-রবি-কবি, রবি-সূর্য এবং নির্ঝর-ঝরনা এই ত্রয়ী শক্তির অপূর্ব মিলন-সূত্রে এক কাব্যিক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। যা কবিতাটির আকৃতি এবং মেজাজ তৈরিতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও কবিতাটির প্রাণের স্পন্দন তৈরিতে ঝরনার ছন্দময় গতির শক্তিকে নবায়িত করা হয়েছে। পরিশেষে প্রভাত পাখির গান শুভ সূচনাকারী মঙ্গলসঙ্গীত বলে বিবেচিত হয়েছে কবির কাছে। এভাবেই কবি কবিতার ভেতর প্রকৃতির এক ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। এ বাতাবরণ মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির, সুন্দরের সঙ্গে সুন্দরের, দৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টির, ভাঙার সঙ্গে গড়ার এবং শক্তির সঙ্গে ভক্তির এক মেলবন্ধন। এ মেলবন্ধন কবিতাটিকে কবির প্রথম শিরোপাধারী কবিতার মর্যাদা এনে দিয়েছে। কবির যাত্রা হল শুরু ঘর 'হইল বাহির' দৃষ্টি গেল খুলে, চেতনাতে এলো দোলা, অদম্য সাহসে পাষাণ ভাঙার প্রত্যয় 'ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ কারা' এভাবেই সীমার মাঝে অসীমের স্থায়ী সন্ধান খুঁজে পেলেন কবি এটিই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার বড় ম্যাসেজ এবং উল্লিখিত তাবৎ অর্থভাবনা, বিষয়ভাবনা, শিল্পভাবনারই এক ছন্দময় গতিবাদী চেতনার পোয়েটিক ভ্যালুজ। (নির্ঝর-ঝরনা; নির্ঝরজল-ঝরনার পানি; নির্ঝর স্রোত-ঝরনা ধারা; নির্ঝর গুঞ্জন-ঝরনার ধ্বনি; নির্ঝরের স্বপ্ন-ঝরনার স্বপ্ন। কর-কিরণ; ভূধর-পাহাড়; শিখর-চূড়া; পাষাণ-পাথর; লহরী-তরঙ্গ; রবি-সূর্য)। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কতিবার এ ভ্যালুজ 'প্রভাতসংগীত' কাব্যগ্রন্থের আর সব কবিতার মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে উদ্ভাসিত রয়েছে।

'হৃদয়ে আজি মোর কেমনে গেল খুলি/জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।' (রবীন্দ্রনাথ)।

জগৎ এবং জীবনের অটুট বন্ধনের নিশ্চিত বিশ্বাসে কবি- ভাবনার অগ্রযাত্রা, এখান থেকেই পেয়েছে বিশ্বলোকের সাড়া।

এ সাড়াতে অবশ্যই কবির ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, সাধনা কাজ করেছিল। এযেন কবির কাব্য মাঠে যোগ্য অভিযাত্রী হিসেবে স্ট্যান্ডিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে যাওয়া। কবি দাঁড়ালেন পেছনের ঘরোয়া অভিজ্ঞতায় ভর করে। এ অভিজ্ঞতা অনেক স্বপ্নমিশ্রিত ছিল। সেই স্বপ্ন, প্রেম, ভালোবাসা, আবেগেরও ছিল।

সব ভাবে সব কাজে/আমার সবার মাঝে
শয়নে স্বপনে থেকে/তবু ছিল একা সে
প্রভাতের আলোকে তো ফোটে নাই প্রকাশে। (রবীন্দ্রনাথ)।

এমন অপ্রকাশিত ভাবনার সঙ্গে একদিন স্বপ্নচারিণীদের ভুলতে না পারার কাতরতা তার কবিতা গানেও আমরা পেয়েছি। কবি এমন অবস্থার ভেতর খুব একটা স্বস্তিবোধ করেননি। কবির ভেতর তৈরি হচ্ছিল পাষাণহৃদয়। সেই হৃদয়ের কাছে বাধা দ্বিধা হল চিরমলিন।

‘নিশার স্বপন ছুটল রে, এই ছুটল রে।
টুটল বাঁধন টুটল রে।’ (রবীন্দ্রনাথ)।
এভাবেই কোমল ভাবনার অবসা ঘটিয়ে কবি পেলেন এক জীবনদেবতার প্রাকৃতিক শক্তি যে শক্তিতে কবি ভাবনাতে এলো দ্রোহের উচ্চারণ।
‘রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।’ (রবীন্দ্রনাথ)
স্বপ্ন জয়ের এ সাহস সবই কিন্তু তার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের সাহস। এখান থেকেই কবি হয়ে ওঠেন প্রকৃতির কবি। এ প্রকৃতি পাহাড়, পর্বত, ঝরনা, সূর্য, কিরণ, আকাশবেষ্টিত জীবন-প্রকৃতি যার অপর নাম বাংলাদেশ।

মো: রায়হান খান
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইলঃ raihan.khan01@northsouth.edu